সাতবাহন বংশ ঃ

দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে মৌর্যদের উত্তরসূরীদের মধ্যে সাতবাহনেরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। মৌর্যোত্তর যুগে সাতবাহনেরা সর্বপ্রথম দাক্ষিণআত্যে স্বাধীন এবং সার্বভৌম আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের ঐক্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যখন বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয় তখনও দক্ষিণ ভারত বৈদেশিক শাসন থেকে মুক্ত ছিল। সেই সুযোগে সাতবাহনেরা দক্ষিণ ভারতের মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। প্রাচীনতম সাতবাহন লেখ খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে যে তারা কাণ্বদের পরাজিত করে মধ্য ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। আদি সাতবাহনদের লেখগুলি পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রে। এ থেকে মনে হয় যে দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী উপত্যকায় সাতবাহনদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা বর্তমান অন্ধ্র এবং কর্ণাটক অঞ্চলে প্রসারিত হয়। আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভট্টিপ্রলু শিলালিপি থেকে জানা যায় যে অশোকের বংশধরদের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে মৌর্য শাসন বিলুপ্ত হয়। সেইসময় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রকে কেন্দ্র করে সাতবাহন বংশ একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপান করে। শক্তি ও গৌরবের দিক দিয়ে এই সাম্রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ড. গোপালাচারীর মতে, "Of the attempts in Ancient India to crown cultural unity with political unity, the vast and well-organised Mauryan Empire is the earliest and most impressive. The Satavahana empire is the next great attempt."

উপাদান ঃ

সাতবাহনদের রাজনৈতিক ইতিহাস জানার সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ। এছাড়া টলেমির ভূগোল এবং গুণাঢ্য রচিত 'বৃহৎকথা' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগের ইতিহাসের উপাদান প্রধানত তিনটি শিলালিপি থেকে পাওয়া যায়। প্রথমটি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির রাজত্বকালের অষ্টাদশ বছরে রচিত 'নাসিক লিপি' নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টি তাঁর রাজত্বকালের চতুর্বিংশ বৎসরে মা গৌতমী বলশ্রীর সঙ্গে যুগ্মভাবে রচিত। তৃতীয়টি হল নাসিক প্রশস্তি। গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর উনিশ বছর পরে তাঁর মাতা এই প্রশস্তি রচনা করেন। গৌতমীপুত্রের রাজত্বকালের ইতিহাস জানার জন্য, এই শিলালিপিটি সর্বাপেক্ষা

উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কানহেরী, কার্লে, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিগুলি থেকে সাতবাহনদের আমলের রাজনৈতিক তথা সামগ্রিক ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া পূর্ব এবং পশ্চিম দাক্ষিণাত্য থেকে যথাক্রমে ১৭টি এবং ১৯টি অনুশাসনলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতবাহন শাসকদের মুদ্রা পাওয়া গেছে সোপারা, জোগালথেম্বি, অকোলা এবং বেরারে। এই মুদ্রাগুলিও সাতবাহনদের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করে। এছাড়া সাতবাহনদের সমসাময়িক ও তাঁদের শত্রুপক্ষ পশ্চিম ভারতের শক শাসক নপহানের সময়ের নাসিক এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রাপ্ত লেখ এবং রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখ (১৫০ খ্রিস্টাব্দে) এ ব্যাপারে সাহায্য করে।

আদি নিবাস ঃ

পুরাণে বর্ণিত সাতবাহন রাজাদের অন্ধ্রজাতীয় এবং 'অন্ধ্রভৃত্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় সাতবাহনেরা 'অন্ধ্রপ্রদেশের' অধিবাসী ছিলেন। আদিপর্বের সাতবাহন শাসকদের লেখাগুলি প্রধানত নানাঘাট, নাসিক এবং কার্লে প্রভৃতি এলাকায় প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে। ড. ভাণ্ডারকর, এন. কে. শাস্ত্রী প্রমুখের মতে সাতবাহনেরা আদিতে ছিলেন অন্ধ্রের আদিবাসী। এজন্যই এদের অন্ধ্র বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক শাস্ত্রী অন্ধ্রভৃত্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করেছেন যে অন্ধ্ররা ছিল মৌর্যদের ভৃত্য। পরে তারা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন ভারতের সূচনা করে। এজন্যই এদের 'অন্ধ্রভৃত্য' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার অনুমান করেন যে সাতবাহনেরা অন্ধ্রজাতীয় ছিলেন কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসী নন। আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিকদের মতে সাতবাহনদের অন্ধ্রপ্রদেশ বা অন্ধ্রজাতি কোনোটির সঙ্গেই সংযোগ ছিল না। পুরাণ সংকলনের সময় তারা অন্ধ্রপ্রদেশে রাজত্ব করায় ভুলক্রমে তাদের অন্ধ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। তাদের মতে সাতবাহন রাজারা কন্নড় ভাষাভাষী ছিলেন। কর্ণাটকের বেল্লারি জেলায় তাদের আদি বাসস্থান ছিল।

আবার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে সাতবাহন রাজারা ছিলেন মারাঠা জাতীয় ব্রাহ্মণ। তাঁদের মতে সাতবাহন রাজাদের আদি শিলালিপি নাসিক এবং নানাঘাট অঞ্চলে পাওয়া গেছে। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির লিপিতে পূর্বঘাট পর্বতকে তাঁর রাজ্যসীমী বলা হয়েছে। সুতরাং অন্ধ্রদেশ

তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। খারবেলের হাতিগুম্ফা লিপিতে সাতবাহন রাজ্যকে কলিঙ্গের পশ্চিমদিকে বলা হয়েছে। আদি সাতবাহন মুদ্রাগুলি মহারাষ্ট্রে পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান ছিল সাতবাহন রাজাদের আদি রাজধানী। এই মত পুরাণের বর্ণনায় সমর্থিত। এই প্রমাণগুলির ভিত্তিতে অনেকে মনে করেন যে মহারাষ্ট্র সাতবাহনদের আদি বাসস্থান ছিল। তাছাড়া নেভাসার উৎখনন থেকে সাতবাহন নামাঙ্কিত যে প্রাচীনতম সাতবাহন মুদ্রা পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নেভাসা এবং তার সন্নিহিত দাক্ষিণাত্য এলাকা প্রাচীনতম সাতবাহন শাসকের অধিকারভুক্ত ছিল। অতএব সাতবাহনদের উত্থান ঘটেছিল দাক্ষিণাত্যের মধ্য এবং পশ্চিমভাগে।

তবে সাতবাহনেরা জাতিতে যে অন্ধ্র ছিলেন তা স্বীকার করাই শ্রেয়। কারণ পুরাণে তাদের শুধু অন্ধ্রভৃত্যই বলা হয়নি অন্ধ্র ও অন্ধ্রজাতীয় বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর *ভারত ইতিহাসের সন্ধানে* গ্রন্থে বলেছেন যে সম্ভবত সাতবাহনেরা প্রথমদিকে কাণ্ব বা অন্য কোনো রাজবংশের প্রতি অনুগত ছিল।

কালসীমা ঃ

সাতবাহনবংশ কতদিন স্থায়ী হয়েছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন মৌর্য সম্রাট অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই অর্থাৎ তৃতীয় শতকের শেষ ভাগে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। ভিনসেন্ট স্মিথ, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, গোপালাচারী প্রমুখের মতে ২৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে সাতবাহন রাজত্বের সূচনা হয়। অপরদিকে আর.জি. ভাণ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রমুখের মতে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয়ভাগে সাতবাহন রাজারা তাদের রাজত্ব শুরু করেন। কোনো কোনো পুরাণে তাদের রাজত্বকাল হিসাবে ৩০০ বা ৪৫৬ বছর ধরা হয়েছে। খ্রিস্টীয় ২২৫ অব্দ নাগাদ সাতবাহন শাসনের যে অবসান ঘটেছিল তা প্রায় সুনিশ্চিত। পুরাণের উক্তি সঠিক হলে একথা অবশ্যই বুঝতে হবে যে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষপর্বে সাতবাহন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আবার সাতবাহন রাজাদের সংখ্যা নিয়েও মতপার্থক্য করা হয়েছে। এইচ. সি.রায়চৌধুরীর মতে, "That there were several families of Satakarnis distinct from the main line cannot be denied. If the main line of Satavahana kings consisted of about nineteen princes,

and if the duration of their rule (therefore) be three centuries there is no difficulty in accepting the Puranic statement that Simuka flourished in the time of the later Kanvas, that is to say in the first century B.C."

সাতবাহন রাজত্বের একেবারের গোড়ার দিকে নানাঘাট, নাসিক এবং সাঁচীতে কয়েকটি লেখ উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই লেখগুলি নিঃসন্দেহে হেলিওডোরাসের বেসনগর গরুড়স্তম্ভ লেখরে পরবর্তী। হেলিওডোরাসের লেখগুলি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে উৎকীর্ণ হয়েছিল। ফলে বলা চলে যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাতবাহন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সেই অর্থে এই বংশের রাজনৈতিক অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শেষদিকে নির্দেশ করা অযৌক্তিক। তাছাড়া পুরাণে প্রদত্ত অন্ধ্রবংশীয় রাজাদের তালিকায় এত বেশি এরকমফের যে সামঞ্জস্য বিধান করাই দুরূহ। মৎস্যপুরাণের কোনো পাণ্ডুলিপিতে যদি ৪৬০ বছর ব্যাপী অন্ধ্র রাজাদের শাসনকাল চিহ্নিত হয়। তাহলে অপর পাণ্ডুলিপিতে ২৭২ বা ২৭৫ বছর ব্যাপী রাজত্বকালের কথা জানা যাচ্ছে। লেখমালা ও মুদ্রার সাক্ষ্য মানলে সাতবাহন শাসনের সামগ্রিক দৈর্ঘ্য কোনোক্রমেই ২৭৫ বছরের বেশি দেখানো যেতে পারে না। লেখমালা ও মুদ্রায় উল্লিখিত সাতবাহন রাজার সংখ্যা পনেরোর বেশি নয়।

জাতি পরিচয় ঃ

সাতবাহন রাজাদের জাতি পরিচয় সম্পর্কেও ঐতিহাসিক মহলে বাতবিতণ্ডা আছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে সাতবাহনেরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণিকে রাজমাতা গৌতমী বলশ্রীর নাসিক প্রশস্তিতে 'এক–ব্রাহ্মণ' এবং 'ক্ষত্রিয়-দর্প-মান-মর্দন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় সাতবাহনদের নীচ জাতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্ররা 'দস্যু' বলে ধিকৃত হয়েছেন। সম্ভবত সাতবাহনেরা অনার্য গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। কিন্তু পরে নিজেদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত দেন। তবে ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থগুলিতে যে সব মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় সম্ভবত রক্ষণশীল সমাজ সাতবাহনদের ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করেনি।

সাতবাহনদের রাজনৈতিক ইতিহাস ঃ

সাতবাহন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সিমুক। পুরাণের বিবরণ অনুসারে অন্ধ্র রাজবংশের সিমুক বলপূর্ক কাণ্বরাজ সুশর্মণকে পরাজিত করে এবং শুঙ্গদের অবশিষ্টাংশকে ধবংসসাধন করে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা রেন। নানাঘাট লেখতে তাঁর নাম পাওয়া যায়। ড. সরকারের মতে তিনি বিদিশার নিকটবর্তী অঞ্চল জয় করেন এবং কাণ্ববংশীয় সুশর্মরণকে উচ্ছেদ করেন। সম্ভবত সিমুকের পূর্বপুরুষদের কোনো সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। পুরাণে কোনো কোনো স্থানে তাকে কাণ্ব রাজাদের ভৃত্য বলা হয়েছে। সুতরাং মনে হয় যে তিনি কাণ্বদের অধীনে একজন সামন্তরাজা ছিলেন। তারপর তিনি কাণ্ব রাজা সুশর্মণকে হত্যা করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ২৩ বছর রাজত্ব করেন।

কৃষ্ণ ঃ

পুরাণ অনুসারে সিমুকের পর তার ভ্রাতা কৃষ্ণ বা কণ্হ সিংহাসন লাভ করেন। তিনি আঠারো বছর রাজত্ব করেন। তিনি নাসিক পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন। তাঁর রাজত্বকাল নাসিকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (শ্রমণ মহাপাত্র) একটি গুহা নির্মাণ করেছিলেন। নাসিক লেখতে কৃষ্ণ সাতবাহন কুল-এর রাজা বলে বর্ণিত। এই লেখটির কাল ধার্য্য হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধে।

প্রথম সাতকর্ণি ঃ

সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা ছিলেন সাতকর্ণি। পুরাণ অনুসারে তিনি ছিলেন কৃষ্ণের পুত্র। কিন্তু এন. কে. শাস্ত্রী প্রথম সাতকর্ণিকে সিমুকের পুত্র বলে মনে করেন।

প্রথম দিকের সাতবাহন রাজাদের মধ্যে প্রথম সাতকর্ণির রাজত্বকালের প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। পুরাণ ছাড়াও ভারতীয় সাহিত্যে সাতকর্ণি প্রতিষ্ঠাপতি এবং শক্তি কুমারের পিতারূপে পরিচিত। পেরিপ্লাস গ্রন্থের জ্যেষ্ঠ সারাগানাস প্রথম সাতকর্ণির বিকৃত নামান্তর মাত্র। সাতবাহন রাজাদের মধ্যে একাধিক সাতকর্ণি ছিলেন। সাতবাহন বংশের অন্যান্য সাতকর্ণির সঙ্গে প্রথম সাতকর্ণির পার্থক্য বোঝাবার জন্য তিনি ‘জ্যেষ্ঠ’ শব্দটি ব্যবহার করেন। শিরসত নামাঙ্কিত মুদ্রাও যে প্রথম সাতকর্ণির তাতে সন্দেহ করার কারণ নেই। তাঁর আমলের একটি লেখ এবং কিছু মুদ্রা এবং পুরাণ থেকে প্রথম সাতকর্ণি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। মালব, বিশেষ করে সাঁচী ও পূর্ব মালব এলাকা যে সাতকর্ণির শাসনাধীন ছিল তার আভাস পাওয়া যায়

শিলালেখ এবং মুদ্রাগত তথ্য থেকে। সাঁচীস্তূপের দক্ষিণদিকের প্রবেশ পথে একটি লেখতে উদ্ধৃত একটি বক্তব্য থেকে এ বিষয়ে অনুমান করা যায়। সাতকর্ণির মহিষী নায়নিকার অনুশাসনলিপি থেকে সাতকর্ণির রাজত্বের মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। ড. এইচ.সি. রায়চৌধুরী তাঁর Political History of India গ্রন্থে বলেছেন, "Thus arose under Satarkani I the first great empore of the Godavari Valley which rivaled in extent and power the Sunga empore of the Ganges Valley and the Greek empore of the land of five Rivers."

সাতকর্ণি পশ্চিম মালব, নর্মদা উপত্যকা ও বিদর্ভ জয় করে সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। ড. খরকারর মনে করেন যে মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষ সহ উত্তর দাক্ষিণাত্য প্রথম সাতকর্ণির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাছাড়া উত্তর কোঙ্কন এবং কাথিয়াবাড় তাঁর রাজৈনতিক প্রভাবের অধীনে ছিল মনে হয়। হাতিগুম্ফা লিপি থেকে জানা যায় যে তিনি কলিঙ্গরাজ খারবেল কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি 'দক্ষিণাপথপতি' ও 'অপ্রতিহতচক্র' উপাদি ধারণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠানপুর ও বর্তমান পৈঠান।

প্রথম সাতকর্ণি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মনে করেন যে ভারতে শুঙ্গ সাম্রাজ্যশক্তিকে পরাজিত করে বিজয়োৎসব হিসাবে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণে তাঁর মতের সমর্থন মেলে। একাধিক কারণে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে এতে যেমন তাঁর সার্বভৌমত্ব এবং যুদ্ধং দেহি মনোভাব সূচিত করে তেমনই অন্যদিকে তিনি যে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাও প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় সাতকর্ণি ঃ

দ্বিতীয় সাতকর্ণি দীর্ঘ ৫৬ বছর রাজত্ব করেন (খ্রিস্টপূর্ব ১৬৬ থেকে ১১১ অব্দ পর্যন্ত)। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন যে তিনি সম্ভবত শুঙ্গদের কাছ থেকে মালব জয় করেন। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায় যে এই সময় সাতবাহনদের রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। কল্যাণ বন্দরের ওপর তাদের অধিকার লুপ্ত হয়। সম্ভবত শক ক্ষত্রপ নহপানের অপরান্ত জয়ের ফলে সাতবাহন রাজ্যের ক্ষমতা সংকুচিত হয়।

পরবর্তী রাজাগণ ঃ

পুরাণে বর্ণিত তালিকায় প্রথম সাতকর্ণি ও গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মধ্যবর্তী সময়ের অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণে এই সংখ্যা ১০, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৯ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে হয়তো সাতবাহনদের বিভিন্ন শাখার সন্তান ছিলেন। পুরাণ অনুসারে প্রথণ সাতকর্ণির উত্তরাধিকারী ছিলেন লম্বোদর। অন্য উপায় থেকে মাত্র সাতবাহন বংশীয় তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এরা হলেন আপিলক, কুন্তল সাতকর্ণি এবং হাল। সম্ভবত এদের কেউই মূল সাতবাহন পরিবারের সন্তান ছিলেন না। আপিলক সম্ভবত মধ্যপ্রদেশের সাতবাহনদের কোনো একটি শাখার সন্তান ছিলেন। অপর দুজন ছিলেন কুন্তলের। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এবং রাজশেখরের কাব্য মীমাংসায় কুন্তলের সাতকর্ণির নাম পাওয়া যায়। সময়ের দিক থেকে প্রথম সাতকর্ণি এবং গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান ছিল। এই সময়ে সাতবাহনেরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা ধীরে ধীরে পশ্চিম উপকূল থেকে বিতাড়িত হয়ে পূর্ব উপকূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। শকরাই সাতবাহনদের এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এই শকেরা পূর্ব ইরান থেকে এসে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে নিম্ন সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থান করেছিল। শক ক্ষত্রপ নহপানের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৯ থেকে ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ) শকশক্তি মহারাষ্ট্রের কিছু ইংশ কোঙ্কন, মালব, কাথিয়াওয়াড় এবং রাজপুতানার দক্ষিণাংশের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এবং এর ফলে সাতবাহন রাজবংশের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে পড়ে।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ঃ

গৌতমীপুত্র শ্রী সাতকর্ণি নিঃসন্দেহে সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। সাতবাহনদের এক সংকটময় মুহূর্তে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সিংহাসন আরোহন করেন। তাঁর শাসনকাল আনুমানিক ১০৬ থেকে ১৩০ খ্রিষ্টাব্দ। নাসিক লিপি, নাসিক প্রশস্তি থেকে গৌতমীপুত্র সম্পর্কে জানা যায়। নাসিক প্রশস্তি হল একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল। গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর ১২ বছর পরে তাঁর মা গৌতমী বলশ্রী এই লিপি রচনা করেন। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ লেখর সংখ্যা খুব বেশি নেই। খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখ, জুনাগড় লেখ, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লেখর সঙ্গে এটি তুলনীয়। এই প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র ক্ষহ্বনরাতদের ধবংসকারী ও সাতবাহন বংশের যশ প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণিত (খেখরাত বসনিরবসেসকর ...সাতবাহনকুল যসপতিযপনকর)।

কয়েকটি সূত্র থেকে গৌতমীপুত্রের রাজত্বকাল নির্ণয় করা সম্ভব। প্রথম তিনি নহ্পানের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেছিলেন। শকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গৌতমীপুত্র যে সফল হয়েছিলেন তার অন্যতম প্রধান নজির হল তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে রচিত নাসিক লেখ। এই লেখটিতে বলা হয়েছে যে শক শাক নহপানের জামাতা ঊষভ দাত (ঋষভদত্ত)-র অধীনে যে সমস্ত জমি একসময় ছিল তা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি অন্যদের দান করেছিলেন। নাসিক জেলার বেনাকটক গ্রামে অবস্থা কালে তিনি ত্রিরশ্মি পর্বতবাসী সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে ঋষভদত্তর পূর্ব অধিকারভুক্ত একখণ্ড জমি দান করেন। ঐ একই বছরে উৎকীর্ণ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির কার্লে লেখ থেকে জানা যায় তিনি বলুরক গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের মামাল আহারের অন্তর্ভুক্ত করজক গ্রাম প্রদান করেন। নাসিক এবং কার্লে লেখ থেকে জানা যায় – গৌতমীপুত্র তাঁর রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে অর্থাৎ ১২৪ খ্রিষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র থেকে নহপান তাঁর জামাতা ঋষভদত্তকে উচ্ছেদ করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে 'সাতবাহন-কুল-যশঃ প্রতিষ্ঠানকর' অর্থাৎ সাতবাহনদের যশ প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়েছে। মহারাষ্ট্র ছাড়াও তিনি অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। নাসিক প্রশস্তিতে তাঁকে শক-যবন-পহ্লব-নিমসূদ বলা হয়েছে। যবন ও পহ্লব হল যথাক্রমে গ্রিক ও পার্থিয়ান। গৌতমীপুত্র শকরাজ নহপানকে পরাজিত করেন। সৌরাষ্ট্র, গুজরাত, মালব, বেরার, উত্তর কোঙ্কন দখল করেন। শক যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি মহারাষ্ট্রের গোবর্ধন (নাসিক) জেলায় বেনাকটক নগরী নির্মাণ করেন এবং রাজরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

গৌতমীপুত্রের শাসনাধীন এলাকা ঃ গৌতমী পুত্র সাতকর্ণি সম্পর্কে নাসিক প্রশস্তিতে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলি অঞ্চলের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। এই তালিকায় উল্লেখিত অঞ্চলগুলি হল আসিক বা ঋষিক (সম্ভবত গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্তী কোনো অঞ্চল), অসক (গোদাবরী জেলায় পূর্বতন হায়দ্রাবাদরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত), মূলক (সাতবাহনদের রাজধানী পৈঠানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল), সুরথ (দক্ষিণ কাথিয়াওয়া), কুকুর (পশ্চিম রাজস্থান), অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কন), অনুপ (নর্মদা উপত্যকার মাহিষ্মতী অঞ্চল), বিদর্ভ (বৃহত্তর বেরার) এবং আকর অবন্তী (পূর্ব ও পশ্চিম মালব), এছাড়া এই প্রশস্তিতে তাঁকে বিন্ধ্যপর্বত থেকে মলয় পর্বত (ত্রিবাঙ্কুর পাহাড়) পর্যন্ত এবং পূর্বঘাট পর্বতমালা থেকে পশ্চিমঘাট

পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিপতি বলা হয়েছে। এ থেকে ড. সরকার মনে করেন যে তিনি বিন্ধ্য পরবর্তী সমগ্র ভূভাগের ওপর তার সার্বভৌমত্ব দাবি করতেন। ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে তিনি বিন্ধ্যর দক্ষিণ দিকের সকল ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। গৌতমীপুত্র দাবি করেছেন যে তার সৈন্যদল তিনটি সমুদ্রের (আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর). জল পান করেছিলেন (তি-সমুদ-তোয়-পীত বাহন)। ড. রায়চৌধুরী মনে করেন যে, তাঁর এই দাবির মধ্যে তাঁর এই অঞ্চলের ওপর আধিপত্যের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। ড. কে. গোপালাচারী বলেছেন যে গৌতমীপুত্র অধিকৃত স্থানসমূহের মধ্যে মহেন্দ্র (মহানদী এবং গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালা) এবং চকোরের (পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণভাগে) উল্লেখ আছে। এ থেকে কলিঙ্গ এবং অন্ধ্রদেশ যে তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় শক যুদ্ধ ঃ গৌতমীপুত্রের রাজত্বের শেষপর্বে, শক ক্ষত্রক নহপানের পরাজয় ও মৃত্যু হলে কার্দমক শকেরা নষ্ট শক্তি পুনরুদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। কার্দমক ক্ষত্রপ চষ্টন ও তার সহকারী রুদ্রদামন সাতবাহন শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। জুনাগড় শিলালিপি এবং টলেমির রচনা থেকে জানা যায় যে রুদ্রদামন সাতবাহনদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। গৌতমীপুত্র শক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রুদ্রদামনের কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্রের বিবাহ দেন।

অন্যান্য কৃতিত্ব ঃ নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির শুধুমাত্র বীরত্বের পরিচয় ছাড়াও তার ব্যক্তিগত জীবনেরও কিছু কিছু কথা জানা যায়। কেবলমাত্র রাজ্য বিজেতা হিসেবেই নয়, সুশাসক, প্রজাহিতৈষী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক হিসাবে গৌতমীপুত্র খ্যাতিলাভ করেছেন। প্রজাদের মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর ছিলেন। উচ্চনীচ সকল শ্রেণির প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মকে রক্ষা এবং চতুর্বর্ণকে রক্ষার প্রয়াস করেন বলে নাসিক প্রশস্তিতে বলা হয়েছে। তখন অবশ্য ভারতে বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব হয়েছিল। এছাড়া জীবিকা বা কর্মের ভিত্তিতে উপজাতি গড়ে উঠেছিল। নাসিক প্রশস্তিতে আছে যে তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্প এবং মান চূর্ণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং নিম্নতম শ্রেণির স্বার্থের উন্নতি বিধান করেছিলেন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করেছিলেন। গৌতমীপুত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধদের (মহাসাঙ্ঘিকগণ)-

এর প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণ করেন। কার্লে, নাসিক প্রভৃতি স্থানের বিহারবাসীদের তিনি ভূমি ও গুহা দান করেছিলেন।

বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী ঃ

পুরাণ অনুসারে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির উত্তরসূরি ছিলেন পুলোমা, যাঁকে শিলালেখয় প্রাপ্ত বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ীর সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। পুরাণ অনুসারে বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী ২১ বছর রাজত্ব করেন। ড. রায়চৌধুরী কার্লে লেখর উল্লেখ করে বলেন যে যেখানে তার রাজত্বকাল ২৪ বছর বলা হয়েছে। কার্লে লিপির তথ্য অধিক নির্ভরযোগ্য বলে ১৩০–১৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী রাজত্ব করেন বলে মনে করা হয়।

তাঁর লেখগুলি নাসিক, কার্লে (পুনা) এবং অমরাবতীতে (কৃষ্ণা জেলা) পাওয়া গেছে। নাসিক ও কার্লেতে প্রাপ্ত মোট ৬টি শিলালেখ মহারাষ্ট্রের ওপর তাঁর অধিকারের সুস্পষ্ট প্রমাণ নির্দেশ করে। সাম্রাজ্যের উত্তরাংশের ওপর তাঁর অধিকার ছিল না। কিন্তু অমরাবতীতে প্রাপ্ত লেখ থেকে বোঝা যায় যে কৃষ্ণা নদীর মোহনা থেকে সাম্রাজ্যসীমা প্রসারিত করে তিনি এই ক্ষতি আংশিক পূরণ করেছিলেন। সমগ্র কৃষ্ণা গোদাবরী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেল্লারি জেলাও তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। তবে এ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ড. রায়চৌধুরী এই লেখতে পুলুমায়ীর নামের সঙ্গে বাশিষ্ঠীপুত্র কথাটি না থাকায় তিনি প্রকৃতপক্ষে 'বাশিষ্ঠীপুত্র' পুলুমায়ী ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আবার করমণ্ডল উপকূলে পুলুমায়ীর কয়েকটি মুদ্রায় দ্বিমাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজের চিত্র পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে দক্ষিণে এই উপকূলেও তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করেছইল।

পুলুমায়ীর রাজত্বকালে তাঁকে শক-ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতে হয়। এর ফলে তিনি সাতবাহন সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চল যথা কোঙ্কন, মালব প্রভৃতি শকদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। জুনাগড় শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রুদ্রদামন কয়েকবার পুলুমায়ীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু আত্মীয়তা থাকায় তিনি সাতবাহন শক্তির চূড়ান্ত ক্ষতি করার থেকে বিরত থাকেন। পুলুমায়ীর ভ্রাতা বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি ছিলেন রুদ্রদামনের জামাতা। এজন্য শক-ক্ষত্রপকে সংযত হতে হয়েছিল।

কৃতিত্ব ঃ গৌতমীপুত্র ও বাশিষ্ঠীপুত্রের আমলে সাতবাহন সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সেতুবন্ধন করেচিল। পুলুমায়ীর দুই মাস্তুলযুক্ত জাহাজের ছাপওয়ালা মুদ্রা করমণ্ডল উপকূলে পাওয়া গেছে। এই মুদ্রা থেকে জানা যায় যে এই অঞ্চলে সাতবাহনদের বাণিজ্য চলত। টলেমির 'ভূগোল' থেকে জানা যায় যে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান ছিল বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ীর রাজধানী। এখানে তিনি নবনগর নির্মাণ করেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপটির আয়তন তাঁর সময় বাড়ানো হয়।

বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ীর পর তাঁর ভ্রাতা শিবশ্রী সিংহাসনে বসেন। যাকে অনেক সময় শিবশ্রী সাতকর্ণি বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। শকদের সঙ্গে সাতবাহনদের সংঘর্ষের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো তিনিও বাশিষ্ঠীপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। তার নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে, কৃষ্ণা এবং গোদাবরী জেলায়। শিবশ্রীর সময় শকদের সঙ্গে সংগ্রাম পুনরায় আরম্ভ হয় এবং এর ফলে সাতবাহনরা অনুপ এবং অপরান্তের ওপর তাদের অধিকার হারায়। তাঁর কানহেরী লেখতে জানা যায় তিনি জনৈক মহাক্ষত্রপের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কানহেরী লেখে এই মহাক্ষত্রপের নামের স্থলে নামের আদ্যক্ষর 'রু'–এর উল্লেখ আছে, এর থেকে মনে করা হয় যে সাতবাহন রাজ বাশিষ্ঠীপুত্র সাতকর্ণি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর সাতকর্ণি সম্ভবত শকরাজ্যের কিছু অঞ্চল অধিকার করেন।

এরপর শিবস্কন্দ সাতকর্ণি আনুমানিক ১৬৭–১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ এবং যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি ১৭৪–২০৩ খ্রিষ্টাব্দ যথাক্রমে সিংহাসনে আরোহন করেন।

সাতবাহন বংশের ২৭ সংখ্যক রাজা যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি সাতবাহন বংশের গৌরব দ্বিতীয়বার পুনরুদ্ধার করেন। সাতবাহন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নৃপতি ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি। ড. রায়চৌধুরীর মতে তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬৫–১৯৪ অব্দ। ড. যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি। ড. রায়চৌধুরীর মতে তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬৫–১৯৪ অব্দ। ড. মুখোপাধ্যায়ের হিসাব অনুসারে নাসকি, কানহেরী এবং কৃষ্ণা জেলায় তাঁর লেখগুলি পাওয়া গেছে। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা ও গোদাবরী জেলায়, মধ্যপ্রদেশ, বেরার, উত্তর কোঙ্কন, বরোদা এবং কাথিয়াওয়াড়ে তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে। তিনি মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র শাসন করতেন। শকদের কাছ থেকে তিনি অপরান্ত পুনরুদ্ধার করেন। সোপারায় (প্রাচীন সূর্পরক, অপরান্তের রাজধানী) তাঁর যে রৌপ্যমুদ্রাগুলি

পাওয়া গেছে সেগুলি এর অন্যতম প্রমাণ। এ মুদ্রায় শক মুদ্রার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট বলা যেতে পারে যে যজ্ঞশ্রী শকদের কাছ থেকে অপরান্ত উদ্ধার করেছিলেন। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির মুদ্রায় জাহাজের চিত্র থেকে মনে করা হয় যে তাঁর সাম্রাজ্য থেকে সামুদ্রিক বিস্তৃতি হয়েছিল। শকদের মুদ্রার মতো তিনি তাঁর মুদ্রায় নিজ মাথার প্রতিমূর্তি খোদাই করেন।

বঙ্গোপসাগরের তীর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পারজিটারের মতে তাঁর আমলে পুরাণের সম্পাদন করা হয়। দার্শনিক নাগার্জুনের তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলও সম্ভবত যজ্ঞশ্রীর রাজ্যভুক্ত ছিল।

বয়সের ভারে এবং ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য সাতবাহন শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাও একে দুর্বল করেছিল। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির রাজত্বের শেষ দিকে এই দুর্বলতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আভীরগণ তখন নাসিক অঞ্চল তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির উত্তরাধিকারী রূপে পুরাণে বিজয়, চন্দ্রশ্রী বা চণ্ডশ্রী এবং পুলোমা বা পুলুমায়ীর উল্লেখ আছে।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণির পর সাতবাহন শক্তি দ্রুত ক্ষয় পায়। তাঁর পরবর্তী রাজাদের মধ্যে বিজয় সাতকর্ণি, চন্দ্রশ্রী ও পুলুমায়ির নাম করা হয়। আভীর জাতির আক্রমণে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগ হাতছাড়া হয়। শান্তমূলের নেতৃত্বে ইক্ষ্বাকুগণ কৃষ্ণা উপত্যকা অধিকার করে, সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ পল্লবগণ অধিকার করে। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসান ঃ

আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশে সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসান হয়। আভীর জাতির আক্রমণে নাসিক অঞ্চল সাতবাহনদের হাতছাড়া হয়। শান্তমূলের নেতৃত্বে ইক্ষ্বাকুগণ কৃষ্ণা উপত্যকা অধিকার করে, সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ পল্লবগণ অধিকার করে। নন্দবংশের সময় থেকে দাক্ষিণাত্যে যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সাতবাহনদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার অবসান ঘটেছিল। মহারাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যপ্রদেশে বাকাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

সামাজিক অবস্থা ঃ

সাতবাহন যুগের সমাজ জীবনের কিছু ছবি তুলে ধরা পড়েছে সমকালীন লেখে সাহিত্যিক উপাদানে এবং ভাস্কর্যে। সমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণেরা সাধারণত পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের উপজীবিকা ছিল যুদ্ধবৃদ্ধি। বৈশ্যদের উপজীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি। শূদ্ররা ভৃত্যের কাজ করতেন। তাছাড়া বিভিন্ন পেশাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভব নয়। চারটি শ্রেণির নাম ছিল – (ক) মহারথী, মহাভোজ প্রভৃতি সামন্ত শ্রেণি। (খ) অমাত্য-মহামাত্য প্রভৃতি কর্মচারী। নিগম বা ব্যবসায়ী শ্রেণি। সার্থবাহ বা বণিকশ্রেণি। (গ) লেখক, বৈদ্য, জলকীয় বা শ্রেষ্ঠী কৃষক প্রভৃতি। (ঘ) সূত্রধৰ মালাকার বণিক বা কর্মচার মৎস্যজীবী প্রভৃতি। এই চারটি শ্রেণি যথাক্রমে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণি নামে পরিচিত।

কিন্তু সাতবাহনগণ বিভিন্ন শ্রেণির পার্থক্য কঠোর ভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করলেও বাস্তবক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ হল বৌদ্ধধর্মের প্রসার। আরেকটি কারণ শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতির দক্ষিণ ভারতে আগমন। সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্রের পুত্রকে শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কন্যার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। তাছাড়া স্থানীয় গোষ্ঠীর অনেকে আর্য রীতিনীতির ও বৃত্তি গ্রহণ করে আর্যসমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাতবাহনরাজ উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হলেও দক্ষিণের স্থানীয় অধিবাসীদের প্রথাকে অস্বীকার করতে পারেননি। এককথায় বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার আচরণের সঙ্গে তাঁরা স্থানীয় আচার আচরণের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

যৌথ পরিবার ছিল তৎকালীন সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র, নাতি নাতনিরা সবাই একসঙ্গে দান ধ্যান করতেন, তা অমরাবতীর লেখমালায় উল্লেখ আছে। নাসিক প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে নায়নিকা বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিজ হস্তে শাসনভার তুলে নেন। সে যুগে একজন মহিলার বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে সাতবাহন যুগে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থা ছিন্ন পিতৃতান্ত্রিক। আর্য সমাজে মাতার চেয়ে পিতার গুরুত্ব বেশি। কিন্তু সাতবাহন সমাজে রাজাদের নাম তাঁদের মায়ের নামানুসারে হত।

গাথা সপ্তশতীতে সমসাময়িক লোকদের সামাজিক আচার আচরণ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের নারীরা ছিলেন সঙ্গীত এবং নৃত্যকলায় পারদর্শিনী। কাব্য সাহিত্যের প্রতিও তাঁদের গভীর আকর্ষণ ছিল। শৈশব থেকেই তাঁদের এসব বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল।

অমরাবতী ও কার্লের ভাস্কর্যে সে যুগের বসন ভূষণের পরিচয় মেলে। ভাস্কর্য মূর্তিগুলির স্বল্পবাস এবং অলংকারের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। মূর্তিগুলির নিম্নাঙ্গ বস্ত্রসজ্জিত কিন্তু ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পুরুষ মূর্তির মাথায় উষ্ণীষ। অলংকারের প্রতি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান আগ্রহ। অলংকারের মধ্যে রয়েছে দুল, বালা, ব্রেসলেট, হার এবং অনন্ত। প্রায় সব নারীমূর্তির পায়ে নুপূর।

নিগম বা শ্রেণি ঃ চাষি ও বণিকরা কতকগুলি 'গৃহ' ও 'কুলে' বিভক্ত ছিল। এদের প্রত্যেকটি প্রধানকে যথাক্রমে 'গৃহপতি' ও 'কুলপতি' বা 'কুটুম্বি' বলা হয়। 'গৃহপতি' রা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'নিগম' বা 'শ্রেণি' সাতবাহন সমাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 'নিগম' বা 'শ্রেণি' সাতবাহন সমাজের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই 'নিগম' বা 'শ্রেণি' গুলির আধিক্য দেখে মনে হয় সাতবাহন সাম্রাজ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রচলন ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা ঃ

সাতবাহন রাজারা বৈদিক হিন্দুধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা দাবী করেছেন, তারা ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণিকে 'এক ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যে একক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সাতবাহন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নানা ধরনের যজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হত। অনারম্ভনীয়; রাজসূয়, অশ্বমেধ, দশরাত্র, আঙ্গিরসতিরাত প্রভৃতি যজ্ঞ সম্পন্ন হত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষিণা দেওয়া হত। প্রথম সাতকর্ণি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সাতবাহন রাজারা ব্রাহ্মণদের ভূমি ছাড়াও অর্থ, অশ্ব প্রভৃতি দান করেন। ইন্দ্র, চক্র, সূর্য, বাসুদেব তাঁদের উপাস্য দেবতা ছিলেন, এছাড়া শিব, স্কন্দ ও মাতৃদেবতার পূজাকেও তাঁরা সমর্থন করতেন। শিবপালিত, বিষ্ণুপালিত ইত্যাদি নাম শিব এবং বিষ্ণু পূজার আভাস দেয়। এইভাবে বলা যায় যে, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় দক্ষিণে এসেছিল।

শৈব এবং বৈষ্ণবধর্ম এবং না পূজাও সাতবাহনদের আমলে জনপ্রিয় ছিল। নায়নিকার 'নানাঘাট' অনুশাশনলিপিতে বহুবিধ যাগযজ্ঞের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা হিসাবে গ্রামদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে এই বংশের রাজারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রচুর সংখ্যক গোরু, ঘোড়া, হাতি, রথ ইত্যাদি দান করতেন। নানাঘাট লেখতে তার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

সাতবাহন যুগে একদিকে যেমন উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতের উপজাতিদের উপর আরোপিত হয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মধ্যে আদিম উপজাতি সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। হিন্দু সাতবাহনগণ বৈদিক ধর্ম পালন করতেন।

বৌদ্ধধর্ম –ধর্মসহিষ্ণুতা ঃ সাতবাহন রাজারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ভারতীয় রীতি অনুসারে তাঁরা ধর্মসহিষ্ণুতা নীতি অনুসরণ করতেন। ভসদায়ন মহাসাংঘিকা প্রভৃতি বৌদ্ধদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। সাতবাহন রাজ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। বিভিন্ন গুহা বিহার ও লেখ থেকে সাতবাহন রাজাদের বৌদ্ধধর্ম নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাসিক, ভট্টিপ্রলু, কার্লে, প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধ গুহাগুলি সাতবাহন যুগে তৈরি হয় এবং এই সকল গুহা বিহারের জন্য সাতবাহন রাজারা গ্রাম ও অর্থ অনুদান করতেন। বৌদ্ধ গুহা ও স্তূপগুলি পশ্চিম উপকূলের বন্দর থেকে বাণিজ্য পথ ধরে দক্ষিণের মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সাতবাহন নগর জুন্নারকে ঘিরে ১৩৫ টি গুহা তৈরি হয়। এছাড়া অমরাবতী, ঘন্টশাল প্রভৃতি স্থানে স্তূপ তৈরি করা হয়।

শাসনব্যবস্থা ঃ

সাতবাহন শাসনব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উপাদান হল শিলালেখতে উৎকীর্ণ রাজকীয় অনুশাসন, মুদ্রা ও সমকালীন বৌদ্ধকালীন বৌদ্ধসাহিত্য। হালের গাথাসপ্তশথী এবং নাসিক লিপি থেকে বিশেষত সাতবাহনদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

সাতবাহনদের রাজধানী ছিল পৈঠান (বর্তমান ঔরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত)। সাতবাহন শাসনব্যবস্থা ছিল রাজতান্ত্রিক এবং রাজপত ছিল বংশানুক্রমিক। নীতিগতভাবে সাতবাহনরাজ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি ধর্মশাস্ত্রের বিধান

অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। ধর্মশাস্ত্রে সাতবাহনরাজের ওপর দেবত্ব আরোপ করে তাকে রাম, ভীম, কেশব, অর্জুনের মতো দেবব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সাতবাহন যুগের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হলেও এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে রাজমাতারা সিংহাসন পরিচালনা করলেও রাজাসন ছিল প্রধান পুরুষতান্ত্রিক।

রাজার অভিধা ছিল 'রাজন'। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। সাতবাহন রাজারা দৈবস্বত্বে "Divine Right of Kings"-এ বিশ্বাসী ছিলেন না। ইন্দো-গ্রিক অথবা কুষাণদের মতো আড়ম্বরপূর্ণ উপাধি ব্যবহার করতেন না। রাজা রাজধানী নগরীতে (প্রতিষ্ঠান, নাসিক ও বিষুয়ান্তি) অবস্থান করে রাজ্যশাসন করতেন। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসন বসতেন। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ দেশকে রক্ষা করা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ছিল রাজার প্রধান দায়িত্ব এবং কর্তব্য। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ সমর অধিনায়ক। এছাড়া তাঁর অন্যান্য কর্তব্য ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালনা করা এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং জনহিতকর কার্যসূচি গ্রহণ করা। রাজা বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

গৌতমী পুত্র সাতকর্ণির আমলে শাসনব্যবস্থা সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। ভারতের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে যুবরাজ বলা হত না এবং শাসনকার্যের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা হত না। রাজপরিবারের অন্যান্য 'কুমার' বা রাজপুত্রদের প্রাদেশিক শাসনকার্যে নিযুক্ত করা হত। রাজা নাবালক হলে তাঁর পিতৃব্য বা মাতা রাজার প্রতিভূ হিসাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন। রাজাকে সাহায্য করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক অমাত্য ও পরামর্শদাতা নিযুক্ত হতেন।

সামন্ত শ্রেণির ভূমিকা ঃ বিভিন্ন শাসনকার্যে রাজপুত্র বা কুমারগণ সাহায্য করতেন। বিভিন্ন শ্রেণির সামন্ত রাজারা সাতবাহন শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতেন। সর্বোচ্চ সামন্তরা 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করতেন। ড. গোপালাচারীর মতে রাজা উত্তরাধিকারী সামন্তরা স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করতেন। কোলাপুর ও উত্তর কানাড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালেখ থেকে এদের প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া মহা সেনাপতি, মহাভোজ এবং মহারথী নামে সামন্তর কথা জানা যায়। মহারথী এবং মহাভোজরা বংশানুক্রমিক ক্ষমতা ভোগ করতেন। মহারথীরা যে সকল ভূমিপট্টলী দান করতেন তা নিজ অধিকারে দিতেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে মহারথীরা স্বায়ত্ত্বশাসন ভোগ করতেন। রাজপরিবারের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

অনেক সময় এরা রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে উৎকীর্ণ নাসিক লেখকে রাজামাত্যের উল্লেখ আছে। যাঁরা ছিলেন প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আমল থেকে সাতবাহন সাম্রাজ্যের পরিধি বাড়লে শাসনকার্যের ভার বেড়ে যায়। এই ভার বইবার জন্য নতুন কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করা হয়। এদের নাম ছিল মহাসেনাপতি ও মহাতলোয়ার। ড. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বলেন যে সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলির শাসন তাদের হাতে দেওয়া হত। এর অর্থ সামন্ত কর্মচারী রাজারে দরকার হলে সেনাদল দিয়ে সাহায্য করতেন। তাঁরা নিজ নামে মুদ্রা পর্যন্ত চালাতেন। সাতবাহন সাম্রাজ্যের শেষ দিকে এই সামরিক সামন্ত কর্মচারীরা বিচ্ছিন্নতাবাদ দ্বারা সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ঃ সাতবাহন রাজ্যের প্রদেশগুলি পরিচিত ছিল 'জনপদ' এবং 'রাষ্ট্র' নামে। সাতবাহন রাজারা তাদের প্রত্যক্ষ অধিকৃত অঞ্চলকে জনপদ এবং জনপদকে আহার বা জেলায় এবং জেলাগুলিকে গ্রামে ভাগ করতেন। যুবরাজ কর্তৃক জনপদগুলি শাসিত হত। এগুলি ছিল রাজা বা কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চল। এর পরবর্তী প্রশাসনিক একক ছিল আহার। মৌর্যদের মতো সাতবাহন রাজ্যে জেলাগুলিকে বলা হত 'আহার'। সেগুলি বর্তমান কালের জেলার সঙ্গে অভিন্ন। সেখানকার আধিকারিকরাও 'অমাত্য' এবং 'মহামাত্য' নামে পরিচিত ছিল। সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক ছিল গ্রাম। এর দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল গ্রামণীর ওপর। এই গ্রামই ছিল রাজস্ব ও সৈন্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। হালের গাথাসপ্তশতী থেকে জানা যায় যে গ্রামের 'গ্রামণী'র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বলা হয় গণ্ডাধিপতি। গ্রামগুলিতে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল।

রাজস্ব ঃ সমকালীন দাক্ষিণাত্যের বেশিরভাগ মানুষ ছিল কৃষিজীবী। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। একটি নাসিক লেখতে 'ভাণ্ডাগারিক' শব্দের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে তিনি ছিলেন শস্যভাণ্ডারের রক্ষক। আবার এরকম হতে পারে ভাণ্ডাগারিক ছিলেন 'গিল্ড' বা নিগমের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী। কারণ সমসাময়িক যুগে নহপানের জামাতা উষবদাতর একটি নাসিক লেখতে 'নিগম সভা'র উল্লেখ আছে। এছাড়াও কিছু কর্মচারীদের নাম উল্লেখ আছে সমকালীন লেখমালায়। এগুলি হল – রাজামাত্য, মহামাত্র,

ভাণ্ডাগারিক, লেখক, নিবন্ধকার, দূতক, হৈরনিক, তলবর, মহাতলবর প্রভৃতি। ভূমিকর, সীতাজমি, লবণ শুল্ক, আদালতে দেয় অর্থ এবং জরিমানা প্রভৃতি খাত থেকে সাতবাহন রাজস্ব সংগৃহীত হত। সাতবাহন রাজবংশের শাসনকালে রাজস্ব প্রথা মোটেই কঠোর ছিল না এবং করের সংখ্যা ছিল অনেক কম।

সামরিক ঃ লেখমালাতে 'কাতক' এবং 'স্কন্ধভার' প্রভৃতি শব্দের বহুল ব্যবহার ও সাতবাহন শাসনের সামরিক চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়। রাজা রাজ্য পরিভ্রমণে বেরোলে এই সামরিক ছাউনিগুলি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে কাজ করত। সেই কারণেই অধ্যাপক গোপালাচীর সাতবাহন রাষ্ট্রকে পুলিশ রাষ্ট্র (Police State) আখ্যা দিয়েছেন।

সাতবাহনেরা ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভূমিদান রীতির প্রচলন করেন। প্রথম দিকেই এই জমিগুলো শুধু রাজস্ব মুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে দান গ্রহীতাকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি তাঁর আমলাদের দানপ্রদত্ত জমি বা গ্রামের প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করতেন। রামশরণ শর্মা দেখিয়েছেন দানপ্রাপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সম্ভবত সাধারণ মানুষের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করত ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের পরামর্শ দিত।

তবে সাতবাহন শাসনে কৃষখদের অবস্থা সাধারণভাবে সচ্ছল ছিল না। সামন্ত প্রথার দরুণ কৃষকেরা শোষিত হত। কৃষখের জমিতে মাঝে মাঝে সরকারি কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ ঘটত।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

সাতবাহন যুগের সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে এক দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল। কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তার এই চারটি প্রকরণের মাধ্যমে সাতবাহন অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। সাধারণ লোকের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষির জন্য জলসেচের ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য বিশাল বিশাল জলাধার নির্মিত হত। কৃষিকার্যের উন্নতির ফলে সাতবাহনদের আমলে সামন্ত প্রথার উদ্ভব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গাথাসপ্তশতীতে ধান, গম, ছোলা, শন, কার্পাস ও ইক্ষুর উল্লেখ আছে। প্লিনির বিবরণী ও পেরিপ্লাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় মালাবার অঞ্চলে গোলমরিচ উৎপন্ন হত। কৃষিকাজে দুটি বিশেষ ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একটি হল উদক যন্ত্র এবং অপরটি হল অরহট্ট

ঘটিকা। যন্ত্রটি দেখতে চক্রের মতো এবং আর গায়ে ঘটি বসানো থাকত। উদক যন্ত্র ও অরহট্ট ঘটিকার ব্যবহারের ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সাতবাহন লেখে রাজকীয় ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে। রাজা কখনো কখনো তাঁর নিজস্ব জমি ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দান করতেন। সম্ভবত উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব বাবদ রাজভাণঅডারে জমা পড়ত। লবণ উৎপাদনে রাষ্ট্র সম্ভবত সরাসরি অংশগ্রহণ করত না। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ দিত। তবে রাষ্ট্র উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট ভাগ কর বা শুল্করূপে গ্রহণ করত।

সমকালীন লেখমালা থেকে জানা যায় সাতবাহন যুগে শিল্পের অসাধারণ বিস্তার ঘটেছিল। সাতবাহন লেখমালা থেকে উদক যন্ত্রিক (জলযন্ত্র নির্মাতা), কুলরিক (কুমোর), তিলপিষক (ঘানিওয়ালা), কৌলিক (তাঁতি), ধান্যিক (ধানের ব্যবসায়ী), বংশকার (বাঁশের মিস্ত্রি), কাংস্যকার (কাঁসারি), দন্তকার (হাতির দাঁতের কারিগর) প্রভৃতি কারিগর-শিল্পী শ্রেণির নাম জানা যায়। এই সময় চর্ম শিল্প, দারু শিল্প, বস্ত্র শিল্প, লৌহ শিল্প, প্রস্তর শিল্প ছাড়াও অন্যান্য শৌখিন জীবনের প্রসার ও নাগরিক জীবনের সমৃদ্ধি ও বিলাস এই শিল্পের ক্ষেত্র তৈরি করেছিল। সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে বস্ত্র শিল্পের প্রধান দুটি অঞ্চল ছিল টগরবাটের ও বৈঠান। নাসিক, পৈঠান, কোন্ডাপুর, ভট্টিপ্রলু, অমরাবতী, মাস্কি প্রভৃতি স্থানে সোনা, তামা, শাঁখা, হাতির দাঁতের তৈরি নানারকম গহনা, পোড়ামাটির মূর্তি, মৃৎপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতবাহন লেখমালায় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও মনে হয় এসব শিল্পী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের নিজস্ব সংগঠন বা 'গিল্ড' ছিল। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই সংগঠন। শিল্প বিস্তারের পাশাপাশি বাণিজ্য বিস্তার এবং উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা শুরু হয়। সাতবাহনদের আমলে নতুন নতুন নগরীর পত্তন হওয়ায় বণিক ও শিল্পপতিদের আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করে। নগরবাসী ও বণিকরা তাদের সচ্ছলতার দরুণ সামন্তশ্রেণির গুরুত্বকে অনেকাংশে খর্ব করে দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন সাতবাহন যুগের রাজনীতি ও সমাজের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এইসব নগরী ও জনপদ প্রশস্ত রাস্তার দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটতে শুরু করে। শহরাঞ্চলের খাদ্যশস্য এবং অন্যা চাহিদা পূরণের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর কৃষিজাত পণ্যাদি উৎপন্নের পরিমাপ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং এর ফলে এইসব গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়।

বাণিজ্য কেন্দ্র ঃ সাতবাহন যুগে অন্তর্বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে মালবের উজ্জয়িনী, অন্ধ্রের ধান্যকটক, পশ্চিম অঞ্চলের প্রতিষ্ঠান, নাসিক বা গোবর্ধন, মহীশূরের বা কন্নড়ের বনবাসী, টগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল। এছাড়া ছিল নতুন শহর বেনাকটক প্রভৃতি। পশ্চিম উপকূলের বিখ্যাত বন্দর ভৃগুকচ্ছ থেকে অন্য একটি পথ মালব, গাঙ্গেয় উপত্যকা, তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী হয়ে কাবুল অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত ছিল। দাক্ষিণাত্যে আগে যে বিরাট অনাবাদি অরণ্য অঞ্চল ছিল শক-সাতবাহন যুগে তার পরিবর্তে গ্রাম ও শহর গড়ে ওঠে এবং অন্তর্বাণিজ্য খুবই বাড়ে। টলেমির বিবরণে মাসালিয়া (আধুনিক মসুলিপত্তন) ও ঘন্টকশালের মতো পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী বন্দরের উল্লেখ আছে।

ভারতের পূর্ব উপকূলে বাণিজ্য বন্দরগুলো দিয়ে সাধারণত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালিত হত। উপনিবেশ বিস্তারের ব্যাপারেও এই বন্দরগুলো বিশেষভাবে সাহায্য করে। বাংলার তাম্রলিপ্ত থেকে শুরু করে করমণ্ডল উপকূলে অনেকগুলো বন্দর স্থাপিত হয়েছে। পেরিপ্লাসের ভ্রমণকাহিনি এবং টলেমির ভূগোলে এইসব বাণিজ্য বন্দর এবং আমদানি রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের বিবরণ পাওয়া যায়। রোম সাম্রাজ্যে মশলা রপ্তানি করার জন্য পূর্ব উপকূলের বণিকগণ সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান থেকে মশলা আমদানি করত। টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় দশকে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপ, মালয়, ইন্দোচিন প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

সঙ্গম সাহিত্যে রোম-ভারত বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যবন জাহাজগুলি মুচিরিপত্তনম বন্দরে স্বর্ণমুদ্রা ভরে নিয়ে আসত এবং পরিবর্তে গোলমরিচ ভর্তি করে দেশে ফিরে যেত।

সঙ্গম সাহিত্যে যে বন্দরটিকে মুচিরিপত্তনম বলা হয়েছে পেরিপ্লাসের লেখক এবং টলেমি তাকে মুজিরিস আখ্যা দিয়েছে। পণ্ডিচেরির নিকটবর্তী আরিকামেডুতেও রোমক বণিকদের আরেকটি স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে খ্রিস্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকে রোমক মৃৎপাত্র, পানপাত্র, বাতিদান ও কাঠের পাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাতবাহন যুগে শিল্প এবং বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গিল্ড বা সংঘ বা নিগমগুলির প্রভাব ও শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শিল্পদ্রব্যের কারিগর ও ব্যবসায়ীরা তাদের আলাদা সংঘ বা গিল্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ফলে মৃৎশিল্প, চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতির পৃথক পৃথক সংঘ গঠিত হয়। সংঘগুলি স্থানীয় সরকারি দপ্তরের অনুমোদন লাভ করত। সংঘগুলি গঠনের ফলে নিগমের সদস্য শিল্পী গারিগর বা নবাগত শিল্পী কারিগরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতার হাত থেকে রক্ষা পেত। কারণ নতুন কোনো কারিগর নিগমের সদস্য না হলে স্থানীয় বাজারে ঢুকতে পারত না। সংঘের সদস্যগণ নবাগত শিল্পী এবং কারিগরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা পেত। অপরদিকে প্রতিটি সংঘই নির্দিষ্ট মানের পণ্যদ্রব্য তৈরি করতে বাধ্য থাকত এবং নিম্নমানের পণ্যদ্রব্য তৈরি করলে শাস্তি ভোগ করত। নির্দিষ্ট দামের অতিরিক্ত দামেও কোনো পণ্যদ্রব্য কেউ ক্রয় বিক্রয় করতে পারত না। অপরদিকে সংঘের সদস্যদের সকল প্রকার স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সংঘ বহন করত। অপরদিকে সংঘগুলির উদ্ভবের ফলে ধীরে ধীরে প্রাথমিকভাবে পুঁজির উদ্ভব ঘটে। বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে নিগমগুলির উৎপাদন বাড়ানো হয়। এজন্য ক্রীতদাস বা ভাড়াটে শ্রমিক নিয়োগ করা হত। এই ভাড়াটে শ্রমিকদের যৎসামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। শার্দূলপুত্র নামে এক নিগম প্রধানের ৫০০ কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলি থেকে দূরদূরান্তে মাল চালান হত। এইভাবে একচেটিয়া বাণিজ্যের মুনাফা নিগম প্রধান বা শ্রেণিরা পেত।

সংঘগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাংকের কাজ করত। ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। সুদের বিনিময়ে সংঘগুলো বণিকদের মূলধন সংগ্রহে সাহায্য করত। নাসিকের গুহালিপি থেকে জানা যায় যে নাসিকের নিগম সুদের বিনিময়ে বহু লোকের অর্থ গচ্ছিত রাখত। এই অর্থই অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে বণিকদের ঋণ দেওয়া হত। এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। নারাগুজনিকোন্ডা এবং কাঞ্চির বৌদ্ধ বিহারগুলি সামুদ্রিক বাণিজ্যে উৎসাহ দেয় এবং মূলধন লগ্নি করে বলে জানা যায়।

সাংস্কৃতিক অবদান ঃ

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সাতবাহন যুগ এক স্মরণীয় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত। সাতবাহন লেখগুলি প্রাকৃত ভাষা এবং ব্রাহ্মী লিপিতে রচিত। সাতবাহন যুগে প্রাকৃত ভাষায় রাষ্ট্রীয় ভাষা

রূপে গণ্য ছিল। সাতবাহন রাজারা পৈশাচী প্রাকৃত ভাষার গুণগ্রাহী ছিলেন। এ ভাষা থেকে মারাঠি ভাষার উৎপত্তি হয়। সাতবাহন রাজা হাল (Hala) প্রাকৃত ভাষায় ৭০০ গাথা বা 'গাথাসপ্তশতী'র সংকলন করেন। গাথাসপ্তশথী বিভিন্ন ভাবের গাথা বা কবিতা সংকলন দেখা যায়। মহারাজ হালের আগে জনৈক কবি বৎসতনের সংকলনের ওপর নির্ভর করে এই গাথা সংকলন করেন। এতে সমকালীন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের কথা জানা যায়। এযুগের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল 'লীলাবতী পরিণয়'। এটি হাল এবং লীলাবতীর বিবাহ নিয়ে রচিত হয়। প্রাকৃতে লেখা এই কাব্যের রচয়িতার নাম অজ্ঞাত।

এ যুগের রচিত দুটি মূল্যবান গ্রহণ হল – (ক) সংস্কৃত ভাষায় সর্ববর্মা রচিত কাতন্ত্র। এই গ্রন্থটি বর্তমানে বঙ্গদেশে এবং কাশ্মীরে সমাদৃত। (খ) গুণাঢ্য রচিত বৃহৎকথা। এই গ্রন্থটি বর্তমানে বিলুপ্ত।

তবে সর্ববর্মা এবং গুণাঢ্য যাঁর মন্ত্রী সেই সাতবাহন রাজা কে তা জানা যায় না।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন নাগার্জুন। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি হল – প্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র, মূলমাধ্যমিক শাস্ত্র, শূন্যসপ্তথি, সুহৃল্লেখ। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম এ যুগে রচিত হয় বলে মনে করা হয়। বর্তমানে মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় না কিন্তু তাদের চিনা সংস্করণ আজও সহজলভ্য।

সাতবাহন যুগে প্রাকৃত সাহিত্যচর্চার আর একটি নিদর্শন সে যুগের লেখ। গৌতমী বলশ্রীর নাসিক প্রশস্তি প্রাকৃতে রচিত।

স্থাপত্য ভাস্কর্য ঃ

সাতবাহন যুগে স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য শিল্পকলার কথা উল্লেখযোগ্য। অমরাবতী, ভট্টিপ্রলু, জগ্গয়াপেটা (Jaggayyapeta) , ঘন্টকশাল, নাগার্জুনিকোন্ডা প্রভৃতি স্থানে এ যুগে বেশ কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ নির্মিত হয়। অবশ্য এগুলির কোনোটিই বর্তমান অক্ষত নেই। পাথরের ফলকে স্তূপের চিত্র থেকে স্তূপগুলির গঠনাকৃতির কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। স্তূপের অঙ্গ চারটি হল বেদি, অণ্ড, হর্মিকা এবং ছত্র। স্তূপের বেদি এবং অণ্ড অপরূপ কারুকার্যে মণ্ডিত।

২৩ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট ভূপালের সাঁচী স্তূপটি এখনও বিদ্যমান। স্তূপটি সুদৃশ্য চারটি তোরণ এই পর্বেই নির্মিত হয়। প্রস্তর বেষ্টনীর উচ্চতা ৩.২ মিটার। প্রতি তোরণের দুদিকে দুটি চতুষ্কোণ স্তম্ভ। এক একটি স্তম্ভের শীর্ষদেশে তিনটি করে হাতির মূর্তি। হাতিগুলির পৃষ্ঠদেশে তোরণের ওপরের অংশ স্থাপিত। ওপরের অংশে তিনটি সমান্তরাল ফলক আছে। শীর্ষ ফলকটির ওপরে সিংহমূর্তি দুটি চক্র এবং ত্রিশূল বা বজ্র আছে। স্তূপের চারদিকের চারটি প্রবেশদ্বার সবকয়টি একই রকমের। প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারই অত্যন্ত সুন্দর ভাস্কর্য দ্বারা সজ্জিত।

পূর্ব দাক্ষিণাত্যে অমরাবতী অঞ্চলে বহু স্তূপ নির্মিত হয়েছে। অমরাবতীর স্তূপগুলির ভাস্কর্য অত্যন্ত বিখ্যাত। ঈষৎ সবুজ চুনাপাথরে খোদিত অমরাবতীর ভাস্কর্যে আছে বিষয় বৈচিত্র্য। তবে অমরাবতীর ভাস্কর্যে আধ্যাত্মিকতা নয় ভোগবাদই মূর্ত হয়েছে। অমরাবতীর ভাস্কর্যেই এই যুগের শিক্ষাসাধনার চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাছাড়া নাগার্জনিকোন্ডার স্তূপেও এই যুগের শিল্পীরা ভাস্কর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

স্যার জন মার্শাল বলেছেন, "...The reliefs of Amaravati indeed appear to be as truly Indian in style as these of Bharhut and Ellora."

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গা কেটে সাতবাহন যুগে বেশ কয়েকটি চৈত্য নির্মিত হয়। ভাজা, নাসিক এবং কার্লের চৈতন্য গৃহগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মহারাষ্ট্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত চৈত্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত কার্লে চৈত্য। এটির দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার প্রস্থ ১৫ মিটার ও উচ্চতা ১৫ মিটার। কার্লে গুহা চৈত্যটি পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে তৈরি করা হয়েছিল। গুহার ছাদগুলি স্তম্ভের দ্বারা ধরে রাখা হত। স্তম্ভগুলির গায়ে পাথর খোদাই করে অলংকর করা হত। পুনার কাছে ভাজার চৈত্যগৃহটি যেন একটি প্রলম্বিত কক্ষ। প্রদক্ষিণ পথটি ভেতরের দেওয়াল ঘেঁষে নির্মিত। মাঝখানে মূল অংশ এবং মূল অংশেরএকেবারে পেছনের দিকে একটি স্তূপ নিয়ে এই চৈত্যগৃহ। চৈত্যগৃহটির নিকটে একটি বিহার নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য ভাজার চৈত্যগৃহটি এই আমলে নির্মিত হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। নাসিক চৈত্যগৃহটি ভাজার চৈত্যগৃহের তুলনায় অনেক সুন্দর এবং উন্নত। নাসিকের চৈত্যহলের সম্মুখের কারুকার্য, অভিনব বিষয়বস্তুর ওপর নানাপ্রকার ভাস্কর্যকর্ম প্রভৃতি, জাফরির কাজ এটিকে এক অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছে। নিরেট পাথরের পাহাড় কেটে এর নির্মাণ সেই সময়কার শিল্পীদের

অসাধারণ শিল্প দক্ষতার পরিচায়ক। পরবর্তী পর্যায়ে কান্‌হেরি ও ঔরঙ্গাবাদের চৈত্য হল এই প্রকার স্থাপত্যেরই অনুবৃত্তি ছিল। নাসিকে পাহাড়ের গা কেটে এ যুগে কয়েকটি বিহারও নির্মিত হয়। এতের মধ্যে ঋষভদত্ত বিহার ও গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি বিহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি বিহারে রয়েছে একটি করে স্তম্ভবিহীন প্রশস্ত হলঘর। তিনদিকে তিনটে ঘর এবং সামনে সস্তম্ভ বারান্দা।

সাতবাহন রাজাদের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময় শুধু যে দাক্ষিণাত্যের একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল তাই নয়, এই অঞ্চলের সমাজজীবনে, অর্থনীতিতে, ধর্মে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যেও গঠনমুখী, সৃজনধর্মী কর্মকাণ্ডের অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছিল।

কুষাণ সাম্রাজ্য

ভূমিকা ঃ

পার্থীয়দের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক আধিপত্যের অবসান ঘটেনি। পার্থীয়দের পরে কুষাণেরা ভারতে এসেছিলেন। তাঁরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে পার্থীয়দের বিতাড়িত এবং উত্তর ভারতের বিস্তৃত এলাকায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। কুষাণেরা যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তা একদিকে রোম সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত এবং অপরদিকে চিন সাম্রাজ্যের প্রান্ত স্পর্শ করে, দুই শতাব্দীর কিছু বেশি সময় এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়েছিল। যদিও এর গৌরবময় কাল এক শতাব্দীর বেশি নয়। দীর্ঘকালব্যাপী কুষাণদের কার্যকলাপ ভারতীয়দের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ডি.সি. সরকারের মতে "The Kushana period marks an important epoch in Indian history. For the first time after the fall of the Mauryas there was a vast empire which not only embraced nearly the whole of North India, but also considerable territories outside it, as far as Central Asia. India was thus brought into contact with outside world."

দীর্ঘকাল ভারতে শাসন করে ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে কুষাণেরা জড়িয়ে পড়ে। ফলে ভারতে এক মিশ্র সভ্যতার উদ্ভব হয়। তাদের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ফলে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের সংযোগ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছিল। কুষাণেরা ভারতীয় বংশোদ্ভূত না হলেও তারা ভারতকে স্বদেশে পরিণত করেন এবং "ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনে তাঁরা স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন।

কুষাণ যুগের ঐতিহাসিক উপাদান ঃ

চৈনিক রচনাবলী ঃ কুষাণ যুগের ইতিহাস রচনার জন্য চিনা ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। চৈনিক সাহিত্য বলতে বোঝায় সু-মাকিয়েন সংকলিত সি-চি (ঐতিহাসিক দলিল), প্যান কু রচিত ছিয়েন-হান-সু (প্রথম হান বংশের ইতিহাস), ফ্যান ই রচিত হৌ-হান-সু (পরবর্তী হান বংশের ইতিহাস) এবং মা তোয়ান লিন রচিত 'বিশ্বকোষ'। চৈনিক উপাদান থেকে প্রথম দিকের কুষাণ রাজাদের ইতিহাস, কুষাণদের উৎপত্তি এবং ভারতে কুষাণ রাজ্য বিস্তার, কুষাণ রাজাদের চিনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য থেকে পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপাদান ঃ ভারতীয় ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে কলহনের রাজতরঙ্গিণী ও অশ্বঘোণের বুদ্ধচরিত থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া কুমারলাতর কল্পনামণ্ডিকা এবং নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক সূত্র'র নাম উল্লেখযোগ্য।

আর্মেনীয় উপাদান ঃ এ যুগের বাণিজ্যিক ইতিহাস বুঝতে প্রয়োজন হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে লেখা পেরিপ্লাস অব্ দ্য এরিথ্রিয়ান সি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত টলেমির 'ভূগোল'। তাছাড়া মুদ্রা, লেখ, (প্রধানত প্রাকৃত এবং ব্যাকট্রীয় ভাষায় রচিত) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন এ যুগের ইতিহাস রচনার সহায়ক।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ঃ পহ্লব রাজা গন্ডোফারনেস-এর তখৎ-ই-বাহি লিপিতে কোপ নামে জনৈক রাজার উল্লেখ আছে, পাঞ্জতার লিপিতে বর্ণিত মহারাজা কুষাণ, কুজুল কদ্‌ফিসিস্ ভিন্ন অন কেউ নন বলে মনে করা হয়। সিরকাপের কাছে চির টেপ নাম স্থানে আবিষ্কৃত এক রূপার পাতে খোদাই করা লিপিতে 'মহারাজা রাজতিরাজ দেবপুত্র কুষাণ'-নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

এটি কোনো বিশেষ কুষাণ রাজা সম্পর্কে বলা হয়নি। এটি কুষাণ রাজাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত উপাধি বিশেষ। এই মত ড. রায়চৌধুরী ও ড. ডি.সি. সরকার পোষণ করেন।

আফগানিস্তানের সুর্খকোটালে একটি লিপি পাওয়া গেছে। যার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকে জানা যায় যে কুষাণ সম্রাটরা ব্যাকট্রীয়া গ্রিক লিপিতে তাদের লেখগুলি রচনা করেন। আফগানিস্তানের দাস্ত-ই নাবুর লিপি থেকে বিম কদফিসেসের রাজত্বকালের ওপর নতুন করে আলোকপাত করা গেছে। এই লিপির একটি ভাগ প্রাকৃত ভাষায় এবং একটি ভাগ ব্যাকট্রীয় ভাষায় লিখিত। তৃতীয় অংশটির ভাষা এখনও পড়া যায়নি। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে রচিত এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত লেখগুলির মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত কয়েকটি লেখ আমাদের জ্ঞানের সীমা প্রসারিত করেছে। এদের মধ্যে কণিষ্কের বিংশ বছরের কামরা লেখ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কামরা লেখ থেকে প্রমাণিত হয়েছে কণিষ্ক কুজুল কদফিসেস বংশের লোক। এইসব নতুন উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্য কুষাণদের সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে অনেকাংশে স্বচ্ছ করেছে।

মুদ্রা ঃ বর্তমানে প্রথম কণিষ্ক ও তার পরবর্তী শাসকদের অধিকাংশ মুদ্রায় উৎকীর্ণ বক্তব্যের ভাষা চিহ্নিত হয়েছে। এখন কুষাণ মুদ্রাগুলির ভাষা সম্পর্কে গবেষকরা জেনেছেন যে এই মুদ্রাগুলির অধিকাংশ গ্রিক বা ব্যাকট্রীয় লিপিতে রচিত ও মধ্য ইরানীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

স্থাপত্য ঃ স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য নিদর্শন এ যুগের ইতিহাস রচনার সহায়ক। স্তূপ, চৈত্য, প্রাসাদ, মূর্তি প্রভৃতি থেকে কেবলমাত্র শিল্পকলাই নয়, রাজাদের ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি জানা যায়। বিহার, প্রাসাদগুলির ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে কুষাণ যুগের সভ্যতা শিল্পকলা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। সুর্খ কোটালের উৎখনন থেকে একটি রাজকীয় দেবালয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। কারা টেপের উৎখনন থেকে মঠ, স্থাপত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি কুষাণদের বিশেষ করে প্রথম কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা বোঝা যায় পুরুষপুরুরে প্রসিদ্ধ মহাবিহারটি থেকে।

কুষাণ জাতির উৎপত্তি, আদি বাসস্থান এবং ভারতে আগমন – সি চি এবং ছিয়েন-হান-সুর সাক্ষ্য অনুযায়ী কুষাণ ছিল ইউচি জাতির অন্যতম শাখা। ইউচিদের আদি বাসস্থান ছিল টুন-

হুয়াং ও ছিল লিয়েন পাহাড়ের (অর্থাৎ বর্তমান চিনের কান সু অঞ্চলের টুন হুয়াং ও নান লান পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।)

গোষ্ঠী ঃ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দ বা তার কাছাকাছি সময় (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৪–১৬০ বা ১৫৮ অব্দের মধ্যে) হিয়ুং নু (হুন উপজাতি কর্তৃক পরাজিত হয়ে ইউচিগণ পশ্চিমদিকে অভিপ্রয়াণ আরম্ভ করে। পশ্চিমদিকে যাত্রার পথে ইউচি জাতি তাকলামাকান বো গোবি মরুভূমির উত্তরে চলে আসে। এবং উ সুন নামে একটি জাতির সম্মুখীন হয়ে তারা এই গোষ্ঠীর রাজা বা নেতাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এরপর তারা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এবং প্রধান শাখাটি (তা-ইউ চি) আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে সিরদরিয়া নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে সেখানে অবস্থিত শকদের বিতাড়িত করে। এর কিছুকাল পর একসময় ইউচিদের দ্বারা পরাজিত উ-সুন জাতি হিউঙ-নু বা হুনদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে ইউচিদের সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করে। ভাগ্যচ্যুত ইউচিরা তখন পুনরায় পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে অক্ষু বা আমুদরিয়া নদীর তীরে পৌঁছে বুখারা (প্রাচীন সোগডিয়ানা)-য় বাস করতে থাকে। সেখানে বাস করা কালীন কোনো এক সময় (অনুমান করা হয় ১৩০ খ্রিঃ পূঃ-এ) তারা আমুদরিয়ার দক্ষিণদিকে অবস্থিত তা হিয়া (ব্যাকট্রিয়া) বা বাহ্লীক দেশ দখল করে নেয়। এখানে ইউচিরা হিউ সি, শুয়াঙ সি, কুই শুয়াঙ, বা কুষাণ, হি তুন ও কাত সু বা তুসি এই পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতিটি গোষ্ঠী একে জন দলপতির অধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করতেন। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কালক্রমে কুষাণরা শক্তিশালী হন। তাদের দলপতি ('kieou-'t'-sieou-kio) কিউ সিউ কিও অন্যান্য গোষ্ঠীদের পরাজিত করে রাজা উপাধি ধারণ করেন।

কুজল কদফিসেস ঃ

হৌ-হান-সু-র সাক্ষ্য অনুসারে, তা হিয়া দখলের এবং ইউচিদের ৫টি শাখার মধ্যে তা হিয়া বিভক্ত হওয়ার একশো বছরের কিছু পরে, অর্থাৎ আনুমানিক ৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু পরে জিউ কিউ ছিয়ে বা কুজল কদফিস কুষাণদের নেতা হন। কিন্তু তিনি বোধ হয় কুষাণদের স্বাধীন নেতা ছিলেন না। কুজুল কদফিস কেবল ব্যাকট্রিয়ার মধ্যেই শিশু কুষাণ সাম্রাজ্যের পরিধিকে সীমিত রাখেননি। চৈনিক উপাদান ও তাঁর বহু সংখ্যক তাম্রমুদ্রা প্রাপ্তি থেকে তাঁর রাজ্য বিস্তৃতি সম্পর্কে বোঝা যায়। সম্ভবত কুজুল কদফিসেস ভারতের গভীরে ঢুকতে পারেননি। উত্তর-পশ্চিম

ভারতের কিছু অংশ এবং কি-পিন বা কাশ্মীর তিনি অধিকার করেন। সম্ভভত পার্থীয়দের পরাস্ত করে তিনি এই অধিকার স্থাপন করেন। কতকগুলি মুদ্রার এক পিঠে ইন্দো-গ্রিক রাজা রারমেয়ুস ও অপর পিঠে কুজল কদফিসেসের নাম পাওয়া যায়। ড. এস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে হারমেয়ুস শক আক্রমণের বিরুদ্ধে কুজল-এর সহায়তা নিয়েছিলেন, তাই এইরূপ দ্বৈত মুদ্রা ছাপানো হয়। কিন্তু হারমেয়ুস ও কুজলের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত বেশি যে, এই মত অনেকেই অগ্রাহ্য করেন।

এমন হতে পারে যে হারমেয়ুসের মুদ্রার ওপর কুজল তাঁর নিজের নাম খোদাই করে দেন নিজের আধিপত্য প্রমাণের জন্য। কুজল-এরসঙ্গে হারমেয়ুসের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে করা যায়নি। কুজল-এর রাজত্বকালে সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কারণ হৌ-হান-সু-তে বলা হয়েছে যে তিনি ৮০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর কিছু মুদ্রায় তাঁকে "সত্যধর্মাস্থিত" বলা হয়েছে। সম্ভবত এই খেতাব তাঁর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ইঙ্গিত বহন করে।

বিম কদফিসেস ঃ

আনুমানিক ৬৫ খ্রিস্টাব্দে কুজলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ৭৮ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে মনে হয়। বিম কদফিসেস পার্থীয় সম্রাট এবং ইন্দো-পার্থীয়দের পরাজিত করে তাঁর রাজ্যসীমা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর মুদ্রায় বেদির সামনে উৎসর্গরত রাজার যে চিত্র পাওয়া যায়, তাঁর সঙ্গে পার্থীয় নৃপতি পোটার্জেসের (খ্রিঃ ৩৮–৫১ অব্দ) মুদ্রার হুবহু মিল পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় যে, তিনি পোটার্জেস, বা তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী কোনো পার্থীয় রাজার অধিকার ভুক্ত এলাকার কিছু অংশ জয় করেছিলেন। মুদ্রাগত তথ্যের ভিত্তিতে ড. মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, তিনি ইন্দো-পার্থীয়দের কাছ থেকে আরাকোসিয়া অর্থাৎ কান্দাহার এলাকা এবং সেন-টু অধিকার করেন। সেন-টু বলতে এতদিন সাধারণভাবে ভারত উপমহাদেশ বোঝাত। এখন এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন জানা গেছে যে, কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বে সেন-টু ছিল একটি নদীর উপর এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। সেন-টু এখন কেবল নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা বোঝায়। মথুরায় কুষাণ রাজাদের মথুরার নিকটস্থ মাট্ থেকে প্রাপ্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট বিম কদফিসের রাজকীয় মূর্তি এবং তার পাদদেশে উৎকীর্ণ লেখটি ঐ অঞ্চলে কুষাণদের অধিকার বিস্তারের ইঙ্গিত দেয়। কুষাণ

অধিকার যে আফগানিস্তানে অব্যাহত ছিল দাস্ত-ই-নাবুর থেকে পাওয়া লেখটি দ্বারা তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে তিনি রোম-সম্রাট ট্রাজানের রাজসভায় দূত পাঠিয়েছিলেন। তিনি গ্রিক মুদ্রার অনুকরণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। এই সকল মুদ্রা থেকে তাঁর সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মুদ্রা থেকে জানা যায় যে, তিনি শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং 'মহেশ্বর', 'রাজাতিরাজা', 'সর্বলোকেশ্বর'–প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার ও ভারতীয় শাসনোচিত উপাধি নির্দ্বিধায় প্রমাণ করে যে বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁর অধিকারে এসেছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিসের রাজ্যজয়ের ফলে ভারতের সঙ্গে চিন ও রোম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্ভাবনা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ভারত ও রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে স্থলবাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হয়। ব্যাকট্রিয়া – কাবুল উপত্যকা পাঞ্জাব যমুনা ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ব্যাপী বিস্তৃত ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য এই বাণিজ্যকে সম্ভব করে। এই বাণিজ্য সীমার এক প্রান্তে ছিল ইউফ্রেটিক নদী এবং অপর প্রান্তে গঙ্গা নদী। রোম এবং পার্থিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত শান্তি চুক্তি (খ্রিস্টপূর্ব ৬৩ অব্দ) এই বাণিজ্যকে সাহায্য করে। ভারতীয় রেশম, মশলা এবং মণিমুক্তার বিনিময়ে রোম থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ভারতে আসে। জওহরলাল নেহরু তাঁর ডিস্কভারি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে বলেছেন যে "কুষাণ সাম্রাজ্য একটি বিরাট স্তম্ভের মতো একদিকে গ্রিক-রোমান জগৎ, অপরদিকে চিনা জগতের মধ্যে সেতু বন্ধন করেছিল; ভারত- রোম; ভারত-চিনের মধ্যে কুষাণ সাম্রাজ্য ছিল এক সিংহদ্বার।"

কণিষ্কের সিংহাসন আরোহরণের তারিখ ঃ

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত ও বিভিন্ন যুক্তি থেকে কণিষ্কের তারিখ নির্ণয় সংক্রান্ত ব্যাপারে জটিলতা উপলব্ধি করা যায়। আপাতত ৭৮ খ্রিষ্টাব্দকেই কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের কাল বলে অনুমান করা হয়। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে ভারততত্ত্ববিদদের দ্বিতীয় সভায় ড. গোপেল (D. Gobel) নামক রুশ প্রত্নতত্ত্ববিদ কুষাণ মুদ্রার সঙ্গে রোমান সম্রাটদের মুদ্রার তুলনা করে কুষাণ মুদ্রায় রোমান প্রভাব ধরে কুষাণ সম্রাটদের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এখানে বিম কদফিসেসের সমকালীন রোমান সম্রাট ট্রাজান ও আড্রিয়ানকে ধরা হয়। কণিষ্কের সমকালীন ধরা

হয় আড্রিয়ান এবং পিয়াসকে। এই তত্ত্ব মেনে কণিষ্ক প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন বলে ধরে নিতে হয়। ড. দানি কণিষ্কের মুদ্রার রেডিও কার্বন পরীক্ষা করে প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী সময়কাল ধরেছেন। তবে তিনি প্রথম শতক অর্থাৎ ৭৮ খ্রিস্টাব্দের পক্ষেই বেশি মত দিয়েছেন। কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেছেন এ মতই আপাতত গ্রহণীয়। তাঁর লেখমালায় ২৩ তম রাজ্যবর্ষের উল্লেখ আছে। সুতরাং কণিষ্ক ১০১ বা ১০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন বলে আপাতত মনে করা যায়।

কণিষ্কের রাজ্যবিস্তার ঃ

কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে কণিষ্ক নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। এমন কথাও বলা হয়েছে যে তাঁর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যর যুদ্ধোন্মাদনা এবং অশোকের ধর্মীয় উদ্দীপনার সমাবেশ ঘটেছিল। দ্বিতীয় কদফিসের পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কণিষ্ক বিম কদফিসেস-এর বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও নতুন রাজ্য জয়ে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর শিলালিপি মুদ্রা ও চিনা ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে তাঁর রাজ্যসীমা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কুমারলাতর কল্পনামণ্ডিকার চৈনিক অনুবাদে কণিষ্ক কর্তৃক টুং-টিয়েন-চু জয় এবং সেখানে শান্তির কথা আছে। টুং-টিয়েন-চু বলতে পূর্ব ভারতের অংশবিশেষ বোঝায়। চৈনিক এবং তিব্বতি উপাদানের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে তিনি সাকেত (অযোধ্যা) জয় এবং পাটলিপুত্রের ওপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তি অনুসারে পাটলিপুত্র আক্রমণ করে বৌদ্ধ দার্শনিক অশ্বঘোষকে বন্দি করে কণিষ্কের রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়। অশ্বঘোষ কণিষ্কের রাজসভা অলংকৃত করেন।

সারনাথ এবং সাহেত মাহেত অর্থাৎ শ্রাবস্তীতে প্রাপ্ত তাঁর লিপি থেকে জানা যায় যে রাজত্বের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলগুলি তাঁর অধিকারে এসেছিল। পূর্ব ভারতে পাটলিপুত্র অতিক্রম করে তাঁর তাম্রমুদ্রা পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।

পেশোয়ার, সুই বিহার, জেডা (উন্দের কাছে) এবং মানিকিয়ালায় (রাওয়ালপিন্ডির কাছে) প্রাপ্ত কণিষ্কের খরোষ্ঠী লেখ থেকে জানা যায় উত্তর এবং পাঞ্জাব, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁর অধিকারে ছিল। সাঁচীতে (ভূপালের অন্তর্গত) কণিষ্কের সহযোগী এবং কিছুকাল পরের শাসক বাসিষ্কের দুটি লেখ পাওয়া গেছে। একটি বাসিষ্ক কুষাণ এবং আরেকটিতে বাসিষ্কের

শাসনের উল্লেখ আছে। প্রথম লেখটি কণিষ্কের অব্দের দ্বিতীয় সম্বৎসরে লিখিত। যেহেতু কণিষ্ক ঐ অব্দের অন্ততপক্ষে ২৩ সম্বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন সেই হেতু একথা মনে করা যায় যে তাঁর রাজত্বকালেই কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকারী সাঁচী অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। ড. বি.এন. মুখার্জির মতে সেই সময় বাসিষ্ক ছিলেন তাঁর সহযোগী শাসক।

নব আবিষ্কৃত রবাতক লেখটি তাঁর আমলেই উৎকীর্ণ। আফগানিস্তান থেকে পাওয়া ব্যাকট্রীয় ভাষায় রচিত বৃহত্তম এই কুষাণ লেখটি কণিষ্কের রাজত্ব সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছে। এই লেখ অনুসারে কণিষ্কের আদেশ পালিত হত ওজোনো (উজ্জয়িনী-পশ্চিম মালব), সাগিদো (সাকেত), কোসোম্বো (এলাহাবাদের সন্নিহিত কৌশাম্বী), পালিবোথরা (পাটলিপুত্র) এবং শ্রোটোম্পো বা শ্রো-চোম্পো (শ্রী চম্পা – পূর্ব বিহারের ভাগলপুর এলাকা) পর্যন্ত।

ঐতিহাসিক স্মিথের মত চিনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। এর ফলে কাসগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার অনেকের মতে চিনের সেনাপতি প্যান চাও ১০২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সিনকিয়াং-এর ওপর তাঁর অধিকার অক্ষুন্ন রাখেন। সুতরাং কণিষ্ক এই অঞ্চলগুলি অধিকার করেছইলেন তা বলা যায় না।

আলবিরুনি আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলের ওপর তাঁর অধিকার সম্পর্কিত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কলহনের রাজতরঙ্গিণী এবং কয়েকটি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে কাশ্মীর তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। একটি বৌদ্ধ গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদে পার্থিয়ার সঙ্গে কণিষ্কের যুদ্ধের কথা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে পার্থিয়ার রাজার নামোল্লেখ নেই। কারও কারও মতে এই রাজা ছিলেন পাকোরাস (৭৭–১০৫ খ্রিস্টাব্দ)। অনেকে মনে করেন যে কণিষ্ক পার্থিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। আবার অনেকের মতে পার্থিয়ার বিরুদ্ধে কণিষ্কের ভূমিকা ছিল আক্রমণাত্মক এবং পার্থিয়ার রাজা সম্পূর্ণ পরাজিত হন। হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনায় প্রকাশ কণিষ্কের রাজ্যের উত্তর সীমানা সুঙ-লিঙ পর্বতমালা স্পর্শ করেছিল। চিনের হোয়াং হো নদীর পশ্চিমেও যে তিনি তাঁর অধিকার বিস্তৃত করেন সে কথার উল্লেখ করেছেন চিনা পরিব্রাজক।

ভারতের অভ্যন্তরে কণিষ্কের রাজ্যসীমা পূর্বে বারাণসী বা সারনাথ, পশ্চিমে সিন্ধু উপত্যকা, দক্ষিণে সাঁচী ও উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতের বাইরে কণিষ্কের সাম্রাজ্যের সীমা নিম্নলিখিত অঞ্চল দিয়ে বিস্তৃত হয়েছিল যথা – (১) তার নিজস্ব কুষাণ রাজ্য ব্যাকট্রিয়া; (২) বর্তমান সোভিয়েত তুর্কিস্থানের কিছু অংশ যথা – কাশগড়, খোটান এবং ইয়ারখন্দ; (৩) পামির অঞ্চল ও চিনা তুর্কিস্তানের বা সিং-কিয়াং-এর কিছু অংশ। চিনা বিবরণ, বৌদ্ধ গ্রন্থাদি এবং লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, অক্সাস থেকে গঙ্গা, মধ্য এশিয়ার খোরাসান থেকে উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত বেনারস পর্যন্ত কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বহু ভাষাভাষী বহু জাতিগোষ্ঠীর লোক তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এজন্য কণিষ্ক তাঁর লিপি ও মুদ্রায় ব্যাকট্রীয় গ্রিক ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি বিশাল সাম্রাজ্যকে ক্ষত্রপদের দ্বারা শাসন করতেন।

কণিষ্কের ধর্মমত ঃ

রাজ্যজয়ের জন্য নয়, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই কণিষ্ক ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কণিষ্ক নিজে কখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে তাঁর মুদ্রা এবং পেশোয়ার সম্পূট লেখার ওপর নির্ভর করে বলেছেন যে তিনি যদি পূর্বে নাও হন, তাঁর রাজত্বকালের সূচনাতেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে কয়েক বছর রাজত্বের পর তিনি এই ধর্ম গ্রহণ করেন।

কিংবদন্তি অনুসারে কণিষ্ক পাটলিপুত্র জয় করে বিখ্যাত পণ্ডিত অশ্বঘোষকে সঙ্গে করে পুরুষপুর বা পেশোয়ারে নিয়ে আসেন। অশ্বঘোষ তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। কণিষ্ক রাজধানী পেশোয়ারে বহুতল চৈতন্য এবং সংঘারাম নির্মাণ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। সম্ভবত গ্রিক স্থপতি এজেসিলাস এই চৈত্যের নকশা করেছিলেন।

কথিত আছে পার্শ্বর পরামর্শে কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধ সঙ্গীতির চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশন সম্পর্কে দুইটি ঐতিহ্য প্রচলিত। একটি মত অনুসারে স্থানটি ছিল কাশ্মীরের কুণ্ডলবন বিহার। দ্বিতীয় মত অনুসারে পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরের কুবনবিহার। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক প্রথম ঐতিহ্যে আস্থাবান। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুমিত্র এই

অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন। বিখ্যাত লেখক অশ্বঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। কণিষ্কের রাজসভার অন্যতম সদস্য প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ পার্শ্ব এবং প্রখ্যাত লেখক অশ্বঘোষের সহায়তায় এই সঙ্গীতি অসাধ্য সাধন করে। লামা তারনাথ লিখেছেন যে এই সঙ্গীতি আঠারোটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পারস্পরিক কলহ দূর করে। ত্রিপিটকের অলিখিত অংশের লিখিত প্রথম রূপ দেয় এবং লিখিত অংশের ভুলভ্রান্তি দূর করে। শুধু তাই নয়। বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত পণ্ডিত পার্শ্ব ও অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ত্রিপিটকের সম্পাদনা ও টীকা রচনা করেন। তিনমাস ব্যাপী এই অধিবেশনে গৃহীত ও সংকলিত ত্রিপিটকের ব্যাখ্যাসমূহ 'মহাভিভাষ্য', 'বিভাষাশাস্ত্র' নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় এই ভাষ্য ও টীকা রচিত হয় এবং এগুলি তাম্রপত্রে খোদাই করে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা হয়। এটি একটি স্তূপের নীচে রাখা হয় বলে হিউয়েন সাঙ এবং লামা তারনাথ মনে করেন। কিন্তু সেগুলি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কেবল বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র সংকলন ও সম্পাদনার জন্যই নয় বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যার জন্য এই সঙ্গীতি স্মরণীয়। সঙ্গীতির এই অধিবেশনের বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ঘটে এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম জন্মলাভ করে।

হিউয়েন সাঙ ও লামা তারনাথের বিবরণ থেকে এই বৌদ্ধ সঙ্গীতের আহ্বানের উদ্দেশ্য জানা যায়। বুদ্ধদেবের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে মতভেদ ও সংঘাত দূর করে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার উদ্দেশ্যে সম্ভবত কণিষ্ক এই সম্মেলন আহ্বান করেন। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সেগুলির ওপর টীকাভাষ্য রচনা করাও এই সঙ্গীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারে কণিষ্কের ভূমিকা ঃ

বৌদ্ধধর্মে কণিষ্কের অবদানের স্থায়িত্ব ছিল অনেক বেশি। রাজধানী পেশোয়ারে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের ওপর তিনি যে বহুতল বিশিষ্ট বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেছইলেন তা আলবিরুনীর সময় পর্যন্ত যুগ পরম্পরায় বিদেশী পর্যটকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর দেবপালের সময়ের একটি শিলালেখ থেকে জানা যায় যে পেশোয়ারে তিনি যে সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন তা তখন পর্যন্ত বৌদ্ধ সঙ্গীতের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। অপরপক্ষে কণিষ্কের সাম্রাজ্যে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা হয়। তিনি পুরোনো বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও চৈত্যগুলি সংস্কার এবং বহু নতুন মঠ স্তূপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন।

মধ্য এশিয়াতে এই ধর্ম বিস্তারেও তাঁরা সাহায্য করেন। কণিষ্কের সমসাময়িককালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের বাইরে কুষাণ সাম্রাজ্যের নৈকট্য হেতু মধ্য এশিয়ায় এবং দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে প্রথমে চিনে এবং পরে চিন থেকে কোরিয়ায় এবং জাপানে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে কণিষ্কের উৎসাহের অন্ত ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন স্বর্ণ এবং তাম্রমুদ্রায় গ্রিক হিন্দু পারসিক জোরাষ্ট্রীয় প্রভৃতি দেবদেবীর অস্তিত্ব তার প্রমাণ। অনেক মুদ্রায় দেবদেবীর এই বৈচিত্র্য দেখে মনে করেন যে, কণিষ্কের মনে বিভিন্ন ধর্মের সার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে রাজ্যজয় অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কণিষ্ক স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয় অশোকের ভূমিকা পালন করেন।

— ০ —